উপাসনা

কালিনগর মহাবিদ্যালয়
বিভাগীয় পত্রিকা
দর্শন বিভাগ

উপাসনা

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংস্করণ

সম্পাদক ঃ প্রসেনজিৎ গাইন, সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

সহ সম্পাদক ঃ অরবিন্দ সেন, স্বদেশরঞ্জন জানা

প্রকাশক ঃ ডঃ ঈশানী ঘোষ, ভারপ্রাপ্ত অধ্য(া, কালিনগর মহাবিদ্যালয়

কপিরাইট ঃ @ কালিনগর মহাবিদ্যালয়

প্রচ্ছদ ঃ প্রিন্ট দ্যুতি

বর্ণস্থাপন ও মুদ্রণ ঃ প্রিন্ট-অল, বসিরহাট

তারিখ ঃ ১০ ই জুন, ২০২৩

শুভেচ্ছাবার্তা

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের কলেজের দর্শন বিভাগ প্রথমবার তাদের সীমিত ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা নিয়ে একটি বিভাগীয় পত্রিকা প্রকাশ করতে চলেছে। আমি এই উদ্যোগের জন্য দর্শন বিভাগের সকল অধ্যাপক ও যারা লিখেছো, সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানাই। আশাকরি এই পত্রিকা কলেজের বিদ্যায়তনিক সাফল্যের পথে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মেলবন্ধনে এই পত্রিকার আগামীদিনে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এই কামনা করি।

সকলে ভালো থেকো

Ishani Ghosh

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

কালিনগর মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

প্রবাহমান ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার বুকে আজ অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী একটি প্র(সভ্যকুলকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে — শি(া কি শুধুমাত্র একটি অর্থ উপার্জনের পন্থা ? যার হাত ধরে পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দের অন্বেষণকেই বর্তমান সমাজ একমাত্র শ্রেয় বলে বিবেচনা করে থাকে। প্রকৃত উত্তর হওয়া উচিত নএ(র্থক। কিন্তু বাস্তব চলেছে এই প্র(ের সদর্থক উত্তরকে বাহন করে !

প্রকৃতপ(যে শি(া শি(ার্থীকে সত্যের সন্ধানে ব্রতী করে না, সুন্দরের সাধনায় তাকে নিমগ্ন করে না, স্বীয় সৃজনশীলতাকে জাগ্রত করতে পারে না বা সুপ্ত প্রতিভাকে প্রকাশ করতে শি(ার্থীকে অনুপ্রাণিত করতে পারে না এবং একইসাথে যে শি(া আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মমূল্যায়নের প্রকৃত (ে ত্রকে উপস্থাপন করতে অ(ম সেই শি(া ব্যর্থতার সাগরে সর্বদা নিমজ্জিত। বর্তমান শি(া ব্যবস্থার এই নেতিবাচক দিকগুলি থেকে পরিত্রাণের মধ্য দিয়ে শি(াকে কলঙ্কমুক্ত(করার নিমিত্ত সম্ভবত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় উপাসনার। প্র(হল কিসের উপাসনা? উত্তর হল — অন্তরে সত্যের উপলব্ধি বা জাগরণ এবং তার চর্চা ও প্রকাশের উপাসনা(সুন্দরকে আয়ত্ত করার ও তাকে স্মৃতিপটে সর্বদা জাগ্রত রাখার উপাসনা, কঠোর অধ্যায়ন, অধ্যবসায় ও জ্ঞানচর্চাকে সঙ্গী করে স্বীয় মনন-চিন্তন, স্বীয় অনুভূতি ও বিচার বিশ্লেষনী (মতাকে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত করার উপাসনা। শি(কসমাজ ও শি(ার্থীকুলের কর্তব্য হওয়া উচিত এইরূপ উন্নততর ও পরিশীলিত বোধকেই আঁকড়ে ধরে শি(াজগতে বিচরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। আমরা সম্ভবত সেই ল(ই কিছুটা হলেও পাড়ি দিয়েছি উপাসনার হাত ধরে। আর এই উপাসনার অঙ্গনই হল সেই অনুশীলনের (ে ত্র যেখানে শি(ার্থীরা তাদের বোধশক্তি(কে সৃজনশীলতাকে, অধ্যবসায়কে এবং জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান অন্বেষণের সুন্দর মনোবৃত্তিকে স্পষ্ট রূপ দেওয়ার একান্ত প্রয়াস দেখিয়েছে। সুতরাং আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে উপাসনার প্রতিটি পাতাকে এই প্রতিষ্ঠানের শি(ার্থীদের জ্ঞান ও দর্শনচর্চার ফসল দিয়ে সুসজ্জিত করার।

সত্য, জ্ঞান এবং সুন্দরের ও আত্মোপলব্ধির উপাসনার আলোকে বর্তমান প্রজন্মের উপর ত্র(মাগত নেমে আসা অন্ধকার দূরীভূত হোক এবং উপাসনা নামাঙ্কিত পত্রিকার সংকলন শি(ার্থীদেরকে সেই ল(্যই অনুপ্রাণিত করে তুলুক।

প্রসেনজিৎ গাইন
বিভাগীয় প্রধান

সূচীপত্র

* **বিবেকানন্দ ও মুক্তি(র সাধনা** — সুপর্ণা মণ্ডল, (4th Sem.)
* **কেউ 'নারী' হয়ে জন্মায় না ...'** — বিনয় মণ্ডল, (6th Sem.)
* **আত্মোপলব্ধি** — কল্যান দাস, (4th Sem.)
* **মানুষের স্বরূপ ঃ মহাত্মা গান্ধী** — স্বদেশ রঞ্জন জানা, শি(ক, দর্শন বিভাগ
* **কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ** — রেখা মৃধা, (2nd Sem.)
* **জ্ঞানের ((ত্রে সংবেদবৃত্তি ও বোধশক্তি(র ভূমিকা ঃ কান্ট** — রানা বর্মন, (4th Sem.)
* **সাধারণ ধর্ম ও বিশেষ ধর্মঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা** — প্রসেনজিৎ গাইন, সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
* **রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ** — অরবিন্দ সেন, শি(ক, দর্শন বিভাগ

বিবেকানন্দ ও মুক্তি(র সাধনা

— সুপর্ণা মণ্ডল, (দর্শন বিভাগ, 4th Sem.)

স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত কর্মযোগের এক অভিনব ও অপূর্বসাধন হল 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। স্বামীজির চিন্তার যে দার্শনিক ভাবাদর্শের প্রভাব সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে, তা হল অদ্বৈতবেদান্ত। এই অদ্বৈত বেদান্তের ফলিতরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ জগৎকে, বিশেষত নিপীড়িত মানবাত্মাকে গ¬ানিমুক্ত(করতেই পারমার্থিক তত্ত্বের থেকে ব্যবহারিক প্রয়োগেই তাঁর সর্বশক্তি(নিয়োগ করেছেন। কর্মনিরপে(জ্ঞান বা ভক্তি(কে বিবেকানন্দ কখনো মুক্তি(র পথ বলে বিবেচনা করেননি। কর্মযোগের প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষনেই বিবেকানন্দ কোনো কোনো সময়ে গীতাকে বেদবেদান্তের ও ওপরে বলে মনে করেছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি(র নিষ্কাম কর্মসাধনকেই বিবেকানন্দ উপযুক্ত(আদর্শ হিসাবে গ্রহন করেছেন।

বিবেকানন্দ গীতার 'কর্মযোগ' আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, কর্ম তিন প্রকার - কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম। যে কর্ম সকামভাবে করা হয় অর্থাৎ যে কর্মে ফলাকাঙ্খা থাকে বা ফলের প্রতি আসক্ত(হয়ে করা হয় সেই কর্মকে বলে কর্ম। এই জাতীয় কর্মের ফলে মানুষ মুক্তি(র পথ থেকে আরো দূরে সরে যায় এবং জীবের বন্ধন দশা গভীরতর হয়। আর অবিহিত কর্ম বা যে কর্মে অন্যের অমঙ্গল জড়িত থাকে তাকে বলে বিকর্ম। অন্যদিকে, যে কর্মে মানুষ নিরাশক্ত(হয়ে, ফলের প্রতি কোনো আকাঙ্খা না করে, কেবল ঈ(্বরের উদ্দেশ্যে বা মানুষের হিতার্থে করে থাকে তাকে বলে নিষ্কাম কর্ম বা অকর্ম। এই নিষ্কাম কর্মের ফলেই মানুষের জীবনের আত্মন্তিক বিনাশ ঘটে। মানুষ চির মুক্তি(র স্বাদ অনুভব করে।

বিবেকানন্দ গীতার এই নিষ্কাম কর্মকে গ্রহন করলেও এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন একটু ভিন্ন ভাবে। তিনি নিরাশক্ত(ভাবে কর্মে বি(্বাসী ছিলেন। কিন্তু সেই কর্মের (ে ত্রে ঈ(্বরের থেকে জীবের কল্যাণকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। স্বামীজীর জীবনে এমন একটা সময় এসেছিল যখন তিনি সমাধির আনন্দে ডুবে থাকতে চাইছিলেন। জগতের ব্যাপারে ফেরার তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। শ্রীরামকৃষ(তাঁর এই অবস্থা জানতে পেরে তাঁকে বললেন - ''ধিক তোকে। ভেবেছিলাম কোথায় তুই বিশাল বটবৃ(ের মতো হবি, কতলোক তোর ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তৃপ্ত হবে, আর তুই কিনা নিজের মুক্তি(খুঁজছিস।'' — গু(র কাছে শিষ্য শিখলেন কিভাবে মানুষের মধ্যে থেকে ঈ(্বরকে সেবা করতে হয়।

'কর্মযোগ' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বিবেকান্দ বলেছেন — পরার্থপরতা ও সৎ কাজের মাধ্যমে মুক্তি(লাভের নীতি ও ধর্ম পদ্ধতি হল 'কর্মযোগ' । কর্মযোগীর আর কোনো মতে বি(্বাস করার দরকার নেই। এমনকি সে ঈ(্বের বি(্বাস না করতে পারে, নিজের আত্মা কিংবা কোনো আধ্যাত্মিক প্র(্ন না জানতে চাইতে পারে, তার বিশেষ ল(আত্মহীনতায় পৌঁছানো(এ কাজ তাকে নিজে করতে হবে। তার জীবনের প্রতিটি(ণ সাধনা। কারণ কোনো মত বা তত্ত্বের সাহায্য না নিয়ে তাকে শুধু কর্ম দিয়ে পৌঁছাতে হবে সেইখানে, যেখানে জ্ঞানী পৌঁছোন জ্ঞান ও প্রেরনা দিয়ে এবং ভক্ত(পৌঁছোন প্রেম দিয়ে।

জগতের কোনো স্থায়ী মঙ্গল আমরা করতে পারি না। বিবেকানন্দ তাই বলেন, আমরা জগতের সুখ বাড়াতে পারি না। এখানে সুখ-দুঃখের শক্তি(সমষ্টি বরাবরই এক। আমরা শুধু সুখ-দুঃখকে এদিক থেকে ওদিকে বা ওদিক থেকে এদিকে সরাতে পারি মাত্র। কিন্তু পরিণাম একই থাকবে(কারণ, এক থাকা

তার ধর্ম। সুতরাং আমাদের উচিৎ সুখ-দুঃখে বিচলিত না হয়ে নিরাশক্ত(ভাবে মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। যার ফল স্বরূপ ঘটতে পারে আমাদের মুক্তি(লাভ। বিবেকানন্দের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় — মুক্তি(লাভ করার একটি উপায় আছে এবং সেই উপায় হল - এই (ুদ্র জীবন, এই (ুদ্র জগৎ, এই পৃথিবী, স্বর্গ, নরক, এই শরীর এবং যা কিছু সীমাবদ্ধতার সব কিছুকেই ত্যাগ করা। যখনই আমরা ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই (ুদ্র জগৎ ত্যাগ করতে পারি, তখনই আমরা মুক্ত(হই। বন্ধন থেকে মুক্ত(হওয়ার একমাত্র উপায় হল চিরাচরিত নিয়মের বাইরে যাওয়া, ব্যবহারিক কার্যকারণ শৃঙ্খলের বাইরে যাওয়া। অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বিষয়েই আসক্তি(ত্যাগ করতে হবে। এটিই হল মুক্তি(র পথ।

গীতায় বলা হয়েছে - ''যদি আমরা কর্মে আসক্ত(না হই তাহলে কর্মের বন্ধন হয় না। স্বার্থের জন্য কৃতকর্ম দাস সুলভ কর্ম। স্বার্থরহিত কর্মই শ্রেষ্ঠ।'' এই জাতীয় কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্তি(লাভ করতে পারে। বিবেকানন্দের মতে, যাহাই সাধন তাহাই সিদ্ধি। গার্হাস্থ্য বা সন্ন্যাস যেকোনো আশ্রমেরই, যেকোনো কর্ম অনাশক্ত(ভাবে করতে পারলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। অনাশক্ত(কর্মীর প(ে সব কাজই সমান। এই অনাশক্তি(জীবের স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা বিনষ্ট করে। জীব মুক্তি(বা মো(ে র পথে এগিয়ে যায়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে থেকে আমরা যেরকম মুক্তি(অনুভব করি, তা মুক্তি(র আভাসমাত্র। যথার্থ মুক্তি(নয়। প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলাই মুক্তি(। এ জীবন মুক্তি(র এক প্রচন্ড ঘোষণা। নিয়ম চিরন্তর হলে মুক্তি(অসম্ভব। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি(জগতের মধ্যে থেকে মুক্তি(খুঁজে পেতে পারে। মানুষের মধ্যে আগে থেকে মুক্তি(আছে। কিন্তু তা আবিষ্কার করতে হবে। মানুষ তো মুক্ত(ই, তবে প্রতি মুহূর্তে সে এ কথা ভুলে যায়। স্বামীজি তাই বলেছেন —''মুক্তি(আমাদের কাম্য। ভগবানই সেই মুক্তি(। অন্যান্য বস্তুতে যে আনন্দ, এখানেও সেই আনন্দ।''

তাঁর মতে, প্রকৃত ধর্ম শু(হচ্ছে সেইখানে যেখানে এই (ুদ্র জগতের শেষ হচ্ছে। জগতের সকল সুখ-দুঃখ ও বস্তুজ্ঞানের যেখানে শেষ সেখান থেকেই প্রকৃত সত্যের পথ শু(। যতদিন না আমরা জীবনের প্রতি তৃষ(া, আমাদের (ণস্থায়ী শর্তাধীন অস্তিত্বের প্রতি আসক্তি(ত্যাগ করতে পারি, ততদিন ইন্দিয়াতীত সেই আনন্দ মুক্তি(র কিছুমাত্র চকিতে দেখার ও আমাদের কোন আশা থাকবে না। যদি আমরা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মনোগ্রাহ্য (ুদ্র জগতের প্রতি আসক্তি(ত্যাগ করতে পারি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মুক্তি(লাভ করবো। বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হলো অনুশাসনের সীমার বাইরে যাওয়া। এ প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন — বুদ্ধদেব বোধিবৃ(ে র নিম্নে বসিয়া দৃঢ়স্বরে যাহা বলিয়াছেন, সে কথা যে প্রাণ হইতে বলিতে পারে, সেই কেবল ধার্মিক হইবার যোগ্য। তিনি বলিলেন, ''কেবল খাইয়া পরিয়া মূর্খের মতো জীবনযাপন অপে(া মৃত্যু ও শ্রেয়(পরাজয়ের জীবন যাপন অপে(া যুদ্ধ (ে ত্রে মরা শ্রেয়।'' এটিই হল ধর্মের ভিত্তি। যেখান থেকে মুক্তি(র পথ প্রসক্ত হয়ে থাকে।

বিবেকানন্দ তাঁর ব্যবহারিক বেদান্তে বলেছেন, এই জগতকে জড়িয়ে থাকা প্রবৃত্তি ত্যাগ করা খুবই কঠিন কাজ। অতি অল্পলোকই তা পারে। আমাদের শাস্ত্র সমূহে একাজ করতে পারার দুটো উপায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটিকে বলা হয় 'নেতি নেতি (এটা নয়, এটা নয়), অন্যটিকে বলা হয় 'ইতি' (এটা) । অর্থাৎ প্রথমটি না-বাচক এবং দ্বিতীয়টি হ্যাঁ-বাচক। না-বাচক পথটি হলো সর্বাপে(া কঠিন। এ পথ সেই সব মানুষের প(ে ই সম্ভব যারা সর্বচ্চো ও অসাধারণ মনের অধিকারী। এঁরা নিজ দেহ ও মনকে করায়াত্ত করতে পারে। আর মানবজাতির বিরাট সংখ্যক লোক সদর্থক বা হ্যাঁ-বাচক পথকেই বেছে নেয়। এ হলো জগতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলার পথ, বন্ধন গুলোকে বন্ধন ভাঙার জন্য ব্যবহার করার পথ। এটাও এক

ধরনের ত্যাগ। কেবল এ ত্যাগ করা হয় ধীরে ধীরে এবং ত্র(মে ত্র(মে। অর্থাৎ প্রথমটির পথ হলো মুক্তি(র মাধ্যমে অনাশক্তি(লাভ করা। আর পরবর্তী পথ হলো কর্ম ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অনাশক্তি(লাভ। প্রথমটি হলো 'জ্ঞান যোগ' এর পথ। আর দ্বিতীয়টি হলো 'কর্মযোগ'-এর পথ, যাতে কর্মের কোন বিরাম নেই। এই জগতে প্রত্যেককে কর্ম করতেই হবে। একমাত্র যারা আপন আত্মাতেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত, যাদের কামনা-বাসনা আত্মাকে অতিত্র(ম করে না, যাদের মন আত্মাকে ছেড়ে বিপথগামী হয় না, যাদের কাছে আত্মাই সর্বস্ব, তারাই কেবল কর্ম করে না। বাকি সবাইকেই কর্ম করতে হবে। এপ্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ(একটি ভারী সুন্দর উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন — একটি জলস্রোত তার স্বভাব অনুযায়ী প্রবাহিত হতে হতে একটি গর্তের মধ্যে পড়ে ঘূর্নির সৃষ্টি করে এবং সেই ঘূর্নিতে কিছুটা ছোটাছুটি করার পর তার থেকে আবার মুক্ত(স্রোতের আকারে বেরিয়ে এসে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে। প্রতিটি মানুষের জীবন ঐ স্রোতের মতো। সে জীবনের স্রোত ও ঘূর্নিতে পড়ে, স্থান-কাল-কারণের এই জগতে জড়িয়ে পড়ে(কিছুটা ঘুরপাক খায়, চিৎকার করে (আমার যশ, আমার সম্পদ ইত্যাদি) এবং অবশেষে তার থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় তার মূলগত মুক্তি(কে লাভ করে। সারা বি(ে জগৎ এই কাজই করছে। আমরা জানি বা না জানি, আমরা সকলেই জগতের স্বপ্নজাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কাজ করে চলেছি। এ জগতে আমাদের অভিজ্ঞতার কাজ হলো মানুষকে ঘূর্নি থেকে বেরিয়ে আসতে স(ম করে তোলা। সুতরাং কর্মই একমাত্র মুক্তি(র পথ।

মুক্তি(র পথ নিয়ে এত আলোচনার পর যে কথা বলা অতি আবশ্যক তা হল, মুক্তি(র পথ দেখাতে পারেন একমাত্র 'তত্ত্বমসি' ব্যক্তি(। আর বিবেকান্দ যে যথার্থই 'তত্ত্বমসি' বা ত্রিকালজ্ঞ মুনী তা পন্ডিত জহরলাল নেহে(র বক্ত(ব্যকে উদ্ধৃতি করে বলা যায় - ''স্বামী বিবেকান্দ একদিকে যেমন অতীত ভারতের গৌরবে গৌরাবন্বিত, অন্যদিকে তেমনি মানুষের জীবন সমস্যার বিষয়ে আধুনিক মনোভাবাপন্ন। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের মধ্যে তিনি ছিলেন এক প্রকার মিলন সেতু।''

সুতরাং স্বামীজি সারা বি(ে ঘুরে, ব্যক্তি(গত জীবনে কঠোর কৃচ্ছ্রতাসাধন করে যে ধর্মমত প্রচার করেছেন, মুক্তি(র পথ নির্দেশ করেছেন, তা কেবল সাধারণ মানুষের কাছে ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজিত হওয়ার জন্য নয়। যদি আমরা তাঁর বাণীকে, তাঁর আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি তাহলেই তাঁর ত্যাগ, বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রতাসাধন সার্থক হবে এবং আমরা খুঁজে পাবো আমাদের মুক্তি(র পথ।

কেউ 'নারী' হয়ে জন্মায় না ...'

— বিনয় মণ্ডল, দর্শন বিভাগ,6th Sem.)

অয়ি, ইতিবৃত্ত কথা, (ান্ত করো মুখের ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিঃসন্দেহে, ইতিহাসে নারী উপে(ত। ইতিহাস বস্তুতঃ পু(ষের ইতিহাস(নারী সেখানে অবজ্ঞার পাত্র ও অনুপস্থিত। এর ফলশ্রুতি হিসাবে জন্ম নিয়েছে বর্তমানে একটি বহুচর্চিত শব্দ 'নারীবাদ'। আভিধানিক অর্থে 'নারীবাদ' হল সেই মতাদর্শ যা সব নারীর জন্য সমানাধিকারের দাবী করে। অবশ্য এটি নারীবাদের সংকীর্ন অর্থ। প্রকৃতপ(নারীবাদ একটি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন, যার সৃষ্টি কোন একটি সীমাবদ্ধ অবস্থা থেকে নয়(ইতিহাসের এক দ্বিধাবিভক্তি(সময়েই এই আন্দোলনের জন্ম। যার মুখ্য উদ্দেশ্য শুধুই মেয়েদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করা নয়, যার আসল ল(হল সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ বদল।

এই নারীবাদের বীজ নিহিত আছে পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থানের মধ্যে। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় পু(ষের জন্য নির্দিষ্ট হল উৎপাদমুখী ভূমিকা। অর্থাৎ বাইরের কাজ। আর মেয়েরা পেল প্রজনন মুখী ভূমিকা বা অন্দরমহলের কাজ। ফলে জনসম(থেকে, জনজীবন থেকে, নারী অদৃশ্য(গৃহকোনে, পরিবারের (ুদ্র পরিসরে বন্দি নারী ইতিহাসে অদৃশ্য।

এই জন্য নারীবাদের ল(হল এটা ব্যাখ্যা করা, কেন নারী নির্যাতিত ও অধিনস্থ অথচ পু(ষ নয় এবং নৈতিকভাবে কাঙ্খিত ও রাজনৈতিকভাবে সম্ভাব্য উপায় বা পন্থা নির্দেশ করা, যাতে নারী পু(ষের মত একই স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও সাম্য পেতে পারে। তাই নারীবাদী আন্দোলন সমানাধিকার চেয়ে (ান্ত হয় না, চাইবে সাম্য এবং তাদের বি(দ্ধে সবরকম বৈষম্যের অবসান। যে (মতা আজ পু(ষের করায়ত্ত নারীবাদ সেই (মতাকে নারীর হাতে অর্পন করতে চায়। নারীবাদ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও লোকাচারকে ধ্বংস করতে চায়, যা নারী ও পু(ষের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। (মতার এই সমবন্টনের জন্য নারীবাদ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচিত হয়েছে, যার অন্যতম দুটি হল - ১) উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal Feminism) ২) চরমপন্থী নারীবাদ (Rdical Feminism)।

উদারপন্থীদের মতে, পু(ষ ও নারী মানব জাতীর দুটি অঙ্গ। এদের মধ্যে সমাজ শাসনের অধিকার যদি শুধুমাত্র পু(ষকে দেওয়া হয় তাহলে অপর অঙ্গটির অস্তিত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়বে। পু(ষ ও নারীর সামনে সুযোগ ও সম অধিকার থাকলে একটি শ্রেণীর প(অপর শ্রেণীকে বঞ্চনা ও পীড়ন করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্যের বিরোধীতা উদারপন্থী নারীবাদী ভাবনার কেন্দ্রে বর্তমান। উদারপন্থী নারীবাদের বৈশিষ্ট্য হল যে, এরা সমাজ পরিবর্তনের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহন করে না। বরং সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই তারা যুক্তি(ও আইনের পথে সমাজের সমস্ত (ে ত্রে অংশগ্রহণ করতে চায়। তারজন্য সমাজের কাছ থেকে সমান শি(ার সুযোগ, রাজনৈতিক অধিকার ও আইনের পথে সংবিধানের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায় করতে চায়।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সমাজের একটি অংশ সত্রি(য়ভাবে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংগঠিতভাবে আন্দোলন শু(করে। এই নারীমুক্তি(আন্দোলনের আগে পর্যন্ত সমাজে একটা কথা প্রচলিত ছিল, যা প্রখ্যান নারীবাদী Barnadette Mosala এভাবে প্রকাশ করেছেন — ''যখন পু(ষেরা নিপীড়িত হয় তখন তা ট্রাজেডি, যখন নারীরা নির্যাতিত হয় তখন তা প্রথা।''

আধুনিককালের একজন বিখ্যাত উদারপন্থী নারীবাদের সমর্থক সিমোঁ দ্যা ব্যুভোয়া তাঁর Second Sex গ্রন্থে বলেছেন - মানুষের ইতিহাসে এযাবৎ পু(ষকে স্বসত্তারূপে গন্য করা হলেও নারীকে পরসত্তারূপে গন্য করা হয়েছে। এর মূল কারণ নারী ও পু(ষের লিঙ্গগত ও জৈবিক পার্থক্য। নারীর মাতৃত্ব, তার সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব তাকে স্বসত্তা হয়ে উঠতে দেয়নি। তার শারীরিক দূর্বলতাও স্বসত্তা হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। তাই এ(ে ত্রে ব্যুভোয়ার পরামর্শ হল - নারীকেই চেষ্টা করতে হবে যাতে সে

পরসত্তা থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তি(সত্তায় পরিণত হতে পারে। আর এজন্য চাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তবে এই স্বাধীনতার জন্য সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজন।

এপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন — ''আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধর্ম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল — আমরা পশু, উদ্যমহীন, দরিদ্র। তোমরা যদি মেয়েদের উন্নতি করতে পার তবে আশা আছে, নচেৎ পশু জন্ম ঘুচবে না।'' স্বামীজি মেয়েদের বলতেন এঁরা হলো মূর্তিময়ী শক্তি(। যদি এই নারীশক্তি(কে ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় তাহলে সহজেই দেশের উন্নতি হবে এবং সমাজ ও সার্বিক ভাবে সুন্দর হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে তাঁর যথাযোগ্য মন্তব্য — ''মেয়েদের শি(া ও স্বাধীনতা দাও, তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের গড়ে নেবে।''

কিন্তু চরমপন্থী নারীবাদীদের আশঙ্খা অন্য জায়গায়। তারা উদারপন্থীদের পু(ষ, নারী ও মানুষ এই বিভাজনকে স্বীকার করেন না। সমাজ যে নীতির দ্বারা শাসিত হয়ে থাকে উদারপন্থীদের চোখে তা প(যতন্ত্রের দ্বারা শাসিত। চরমপন্থীরা মনে করেন যে, এই মুল স্রোতে 'নারীর অর্ন্তভুক্তি(তাকে মুক্তি(র পথ প্রদর্শন করতে পারে না। কারণ তার ফলে নারী নতুন করে পু(যতন্ত্রের অধিনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আসলে উদারপন্থীরা কল্পনা করেছেন যে, এমন একটি বিধিতন্ত্র সমাজকে পরিচালনা করবে যা প(পাত শূন্য, যার মধ্যে লিঙ্গ সাপে(তা থাকবে না। চরমপন্থীরা এই অভিমতকে সন্দেহের চোখে দেখেন। নারীর আদর্শ যদি পু(যতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত আদর্শের অর্ন্তভুক্ত(হয় তাহলে সমাজের মূল স্রোতের সাথে মিশে গেলে নারীকে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বা মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে হবে।

আমূল সংস্কার পন্থী নারীবাদ বি(্বাস করে যে, নারী নিগ্রহ বা নির্যাতনের মূল কারণ লিঙ্গ বৈষম্য। নারীর প্রজনন মুখী ভূমিকা অথবা লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকায় তাদের অধিনতার মূল কারণ। এদের মতে নারীর নির্যাতন সার্বিক ও সার্বত্রিক এবং একে কিছুতেই শ্রেণী অথবা জাতি নির্যাতনের অধীনস্ত করা যায় না। নারী নির্যাতনের উদ্ভব হয় তাদের যৌনতা এবং প্রজনন, মাতৃত্ব, বাধ্যতামূলক বিপরীত লিঙ্গতা ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রন থেকে। নারীমুক্তি(অর্জনের জন্য নারীর অবস্থান, মর্যাদা ইত্যাদি কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন। নারীর মানসিকতার পরিবর্তন ও জ(রী। তাহলেই পিতৃতন্ত্রের ভাবনা থেকে নারীরা মুক্তি(পাবে। কেননা কোন মানুষ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজ তাকে নারীতে পরিণত করে।

তবে একবিংশ শতাব্দীতে একটু হলেও যেটা আশার কথা তা হল — বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এটা প্রমাণ করে যে নারীরা আজ আর পু(ষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজন, নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই বুঝে নিতে প্রস্তুত। কোন অজুহাতেই তারা আর সমাজের অন্ধ কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ থাকতে রাজী নয়। যদিও বর্তমান সমাজ নারী এবং পু(ষকে আলাদা করে না দেখে উভয়কেই 'মানুষ' হিসাবে দেখতে চেয়েছে। সুতরাং বলাই যায় কবির স্বপ্নের মতো নারীবাদী আন্দোলন ও আজ অনেকটাই সফলতার দিকে —

'' আমি সাম্যের গান গাই
আমার চ(ে পু(ষ রমনী কোন ভেদাভেদ নাই।''

আত্মোপলব্ধি

— কল্যান দাস, (দর্শন বিভাগ,4th Sem.)

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথিবীতে এমন এক মহাপু(ষ জন্মেছিলেন যিনি রাজপরিবারে জন্মালেও পরিবারের অতুল ঐ(র্য ও ভোগবিলাস তাকে আকৃষ্ট করেনি। জরামরণ জনিত মানুষের দুঃখকষ্ট তাঁকে এতই ব্যথিত করেছিল যে, এজন্য তিনি রাজ ঐ(র্য ও সংসারধর্ম ত্যাগ করেন। দুঃখ থেকে মুক্তি(লাভের উপায় অনুসন্ধানের জন্য সাধনা শু(করেন এবং শেষ পর্যন্ত বোধি বা প্রজ্ঞা লাভ করেন। তিনি হলেন মহান দার্শনিক গৌতম বুদ্ধ। বোধি লাভের পর গৌতম বা সিদ্ধার্থ 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন। বোধি বা সম্যকজ্ঞানের আলোকে বুদ্ধদেবের কাছে চারটি মহান সত্য উদ্ভাসিত হয়, যা চারটি মহান আর্যসত্য নামে পরিচিত। সত্যজ্ঞান লাভ করে তিনি মানুষের দুঃখমোচনের জন্য সচেষ্ট হন। এজন্য তিনি অহিংসা, প্রেম ও ক(ণার বাণী প্রচার করেন। বুদ্ধদেব ছিলেন একজন ধর্মপ্রবর্তক, নীতিবিদ এবং সংস্কারক। তাঁর উপলব্ধ আর্যসত্যগুলি হল - ১) দুঃখ, ২) দুঃখ সমুদয়, ৩) দুঃখ নিরোধ এবং ৪) দুঃখ নিরোধ মার্গ।

১) প্রথম আর্যসত্য ঃ দুঃখ ঃ- বুদ্ধদেবের মতে জগৎ ও জীবন দুঃখময়। মানুষের জীবনে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, রোগ, শোক, প্রিয়জনবিয়োগ, অপ্রিয়সংযোগ প্রভৃতি দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। মানুষের জীবন কামনা-বাসনার দ্বারা চালিত। কামনা-বাসনা ও আসক্তি(র মূলে রয়েছে তৃষ(া। কামনা-বাসনা পূরণ হওয়ার ফলে সুখ হলেও পরিনামে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এ জগতে অবিমিশ্র সুখ বলে কিছু নেই, সুখ সর্বদা দুঃখ মিশ্রিত। তাই বুদ্ধদেব বলেছেন - 'সর্বং দুঃখম্' অর্থাৎ সবকিছুই দুঃখময়।

২) দ্বিতীয় আর্যসত্য ঃ দুঃখ সমুদয় ঃ- বুদ্ধদেবের এই দ্বিতীয় আর্য সত্যটি 'প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ' তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব অনুসারে, এ জগতে সব কিছুই কারণ নির্ভর, বিনা কারণে কোন কিছু ঘটে না। এ জগতে আকস্মিক বলে কিছু নেই। কারণ থাকলে কার্য হয়, কারণের অভাবে কার্যেরও অভাব ঘটে। দুঃখ যেহেতু কার্য, সেহেতু দুঃখেরও কারণ আছে। দুঃখের কারণ অনুসন্ধন করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বারটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত(এক কার্য-কারণ শৃঙ্খলের উল্লেখ করেছেন। এই কার্য-কারণ শৃঙ্খলটি হল ঃ- জীবনে (১) দুঃখ আছে। দুঃখের কারণ হচ্ছে (২) জাতি বা পুণর্জন্ম। পুণর্জন্মের কারণ (৩) ভব বা পুণরায় জন্মগ্রহনের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার কারণ (৪) উপাদান বা বিষয়ের প্রতি আসক্তি(। এই আসক্তি(র কারণ (৫) তৃষ(বা ভোগ বাসনা। এই প্রকার কামনার কারণ (৬) বেদনা বা ইন্দ্রিয় সুখ। ইন্দ্রিয় সুখের কারণ (৭) স্পর্শ বা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ। এরূপ সংযোগের কারণ (৮) ষড়ায়তন বা ছয়টি ইন্দ্রিয়। ছয়টি ইন্দ্রিয়ের কারণ (৯) নামরূপ বা দেহ মনের সংগঠন। এরূপ সংগঠনের কারণ (১০) বিজ্ঞান বা মাতৃগর্ভে ভ্রূণের চেতনা। এই প্রাথমিক চেনার কারণ (১১) সংস্কার বা পূর্ণজন্মের অভিজ্ঞতার ছাপ। এই প্রকার সংস্কারের কারণ (১২) অবিদ্যা বা চারটি আর্যসত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এই অবিদ্যা বশত জীব কার্যকারণ পরম্পরায় জরা মরণের কবলে পতিত হয়। অবিদ্যাই হচ্ছে দুঃখের মূল কারণ।

এই কার্যকারণ শৃঙ্খলের দ্বাদশটি অঙ্গ। তাই একে দ্বাদশনিদান বলে। এই বারটি কার্য-কারণ শৃঙ্খল চক্রে(র আকারে সংযুক্ত(হয়ে মানুষকে জন্ম-মৃত্যু জন্মান্তর প্রবাহে আবর্তিত করে। তাই এই কার্য-কারণ শৃঙ্খলটিকে ভবচক্র(বলে।

দ্বাদশ-নিদানকে কারণ-কার্য পরম্পরায় নিম্নোক্ত(ছকের সাহায্যে দেখান যায় —

(১) অবিদ্যা

\

(২) সংস্কার

\

(৩) বিজ্ঞান

\

(৪) নামরূপ

\

(৫) ষড়ায়তন

\

(৬) স্পর্শ

\

(৭) বেদনা

\

(৮) তৃষ(া

\

(৯) উপাদান

\

(১০) ভব

\

(১১) জাতি

\

(১২) জরা-মরণ

(৩) তৃতীয় আর্য সত্য ঃ দুঃখ নিরোধ ঃ- বুদ্ধদেব বলেন, দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা দূরীভূত হলে দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে বৌদ্ধদর্শনে নির্বান বলা হয়েছে। 'নির্বান' শব্দের অর্থ নিয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। বুদ্ধদেবের মতে নির্বানের অর্থ জীবন্মুক্তি(। তৃষ(া জনিত কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রন করে, সত্যের নিয়ম অনুধ্যানের দ্বারা কোন ব্যক্তি(সমাধির চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত হলে তিনি আসক্তি(থেকে মুক্ত(হন। ফলে তিনি বন্ধনের কারণ ছিন্ন করে মুক্ত(হন। তখন তাকে বলা হয় 'অর্হৎ' বা 'পূজনীয় ব্যক্তি('। এই অবস্থায় কামনা-বাসনা দগ্ধ হওয়ায় তৃষ(ার (য় হয় এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। একে নির্বান বলে।

বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর নির্বানের স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। নির্বান সম্পর্কে চারটি অভিমত পাওয়া যায় - (ক) নির্বান হচ্ছে চির অবলুপ্তি (খ) নির্বান এক শা(ত আনন্দময় অবস্থা (গ) নির্বান অনির্বচনীয় অবস্থা এবং (ঘ) নির্বান এক শা(ত ও অপরিবর্তনীয় অবস্থা।

(৪) চতুর্থআর্য সত্য ঃ দুঃখ নিরোধ মার্গ ঃ- বুদ্ধদেব বলেন, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নির্বান লাভের উপায় আছে। নির্বান লাভের যে মার্গ বা উপায় তার আটটি অঙ্গ। তাই একে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি অঙ্গ হল ঃ (i) সম্যক্ দৃষ্টি, (ii) সম্যক সংকল্প, (iii) সম্যক্ বাক্, (iv) সম্যক্ কর্মান্ত, (v) সম্যক আজীব, (vi) সম্যক্ ব্যায়াম, (vii) সম্যক্ স্মৃতি ও (viii) সম্যক্ সমাধি।

(i) সম্যক্ দৃষ্টি ঃ- সম্যক্ দৃষ্টি মানে হল সত্য দৃষ্টি বা সত্য জ্ঞান। আত্মা ও জগৎ সম্পর্কে মিথ্যা দৃষ্টি হল দুঃখের মূল কারণ। তাই নৈতিক সংস্কারের প্রথম স্তর হল সত্য দৃষ্টি বা সত্য জ্ঞান লাভ করা। জগতের অনিত্যতা, জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি(ই যে জন্ম এবং তজ্জনিত দুঃখের কারণ - সে বিষয়ে জ্ঞানই সম্যক্ দৃষ্টি।

(ii) সম্যক্ সংকল্প ঃ- সম্যক্ জ্ঞান হলেই দুঃখ মুক্তি(হয় না, সম্যক্ সংকল্পের প্রয়োজন হয়। সত্য জ্ঞান লাভ করে সেই মতো জীবন যাপনের দৃঢ় ইচ্ছাই সম্যক্ সংকল্প। সত্য জ্ঞানের আলোকে ভোগবাসনা জয় করে কর্ম সাধনের দৃঢ় মনোবাসনাই সম্যক্ সংকল্প। আসক্তি(, হিংসা ও দ্বেষ বর্জন করে সর্বজীবে প্রেম ও ক(ণা বিতরনের দৃঢ় ইচ্ছাই সম্যক্ সংকল্প।

(iii) সম্যক্ বাক্ ঃ সম্যক্ বাক্ এর অর্থ হল বাক সংযম। মিথ্যাভাষণ পরিহার করে সদা সত্য কথন হচ্ছে সম্যক্ বাক্। মিথ্যাকথন, কটুবাক্য, পরনিন্দা, প্রগলভ্-ভাষণ একান্তভাবে পরিহার করে সাধককে সত্যভাষী হতে হবে।

(iv) সম্যক্ কর্মান্ত ঃ সম্যক্ আচরণ হচ্ছে সম্যক্ কর্মান্ত। কাম, ক্রে(াধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অহিংসা, মৈত্রী ও ক(ণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্মসাধন করতে হবে। নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদনই সম্যক্ কর্মান্ত।

(v) সম্যক্ আজীব ঃ সৎভাবে জীবনযাপন হচ্ছে সম্যক্ আজীব। হিংসা বা মিথ্যার আশ্রয় পরিহার করে সৎ উপায়ে সাধককে জীবিকা অর্জন করতে হবে। প্রাণী শিকার, প্রাণী হত্যা, মদ্য বিক্র(য় প্রভৃতি বর্জন করে সৎ ভাবে জীবিকা অর্জন করতে হবে।

(vi) সম্যক্ ব্যায়াম ঃ সৎ চিন্তা ও সৎ প্রবৃত্তির অনুশীলন হচ্ছে সম্যক্ ব্যায়াম। কুচিন্তা ত্যাগ করে সর্বদা সুচিন্তায় নিয়োজিত হতে হবে। সাধককে এ ব্যাপারে সর্বদা যত্নবান ও সতর্ক থাকতে হবে। এই প্রকার মানসিক সতর্কতাই হচ্ছে সম্যক্ ব্যায়াম।

(vii) সম্যক্ স্মৃতি ঃ আর্যচতুষ্টয়ের সম্যক্ জ্ঞান সর্বদা স্মরণে রাখাই হল সম্যক্ স্মৃতি। এই প্রকার স্মৃতির ফলে জগৎ ও জীবনের অসারত্ব বোধ জন্মায়, ভোগসুখে বৈরাগ্য দেখা দেয়, ফলে নির্বানের পথ সুগম হয়।

(viii) সম্যক্ সমাধি ঃ উল্লিখিত সাতটি অঙ্গ যথাযথ অনুষ্ঠিত হলে সাধকের চিত্ত শান্ত হয় এবং সে সমাধির সামর্থ লাভ করে। নিরবচ্ছিন্ন সমাধির ফলে প্রজ্ঞা লাভ হয়। প্রজ্ঞা হল চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান।

সমাধির চারটি স্তর আছে। প্রথমস্তরে বিতর্ক, বিচার অর্থাৎ চারটি আর্য সত্য বিষয়ে মনকে নিবদ্ধ করা হয়। এটি মন থেকে আসক্তি(দূর করতে সাহায্য করে। ফলে মনে একটি প্রীতি বা সুখের অবস্থার উদ্ভব হয়। সমাধির শেষ স্তরে আসক্তি(দূরীভূত হয়ে একটি উদাসীনতার ভাব আসে। এই অবস্থায় প্রজ্ঞার উদয় হয় এবং সাধক নির্বান লাভ করে অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

মানুষের স্বরূপ ঃ মহাত্মা গান্ধী

— স্বদেশ রঞ্জন জানা, শি(ক, দর্শন বিভাগ

উপনিষদকে অনুসরন করে গান্ধীজি মানুষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, এক সর্বব্যাপী চিৎস্বরূপ সত্তা বা ঈ(রের থেকে জগতের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে। অদ্বৈতবাদীদের মতো, গান্ধীজি বি(োস জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ, পশুপ(ীর জগৎ এমন কি মানুষের জগৎ একই চিন্ময় সত্তার বিকাশ হওয়ায় তারা প্রত্যেকে আত্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষ বি(েজগতের অঙ্গীভূত হওয়ায় জগতের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। চিৎস্বরূপ ঈ(রের এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত থাকার জন্য জড়জগৎ ও ঈ(রের প্রকাশ চৈতন্যময়।

মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর কোন গুনগত প্রভেদ নেই। কারণ জগতের সবকিছুর মধ্যেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের অবস্থান। মানুষের সঙ্গে অপরাপর বস্তুর সম্পর্ক তাই সহযোগিতার ও বন্ধুতের সম্পর্ক। এজন্যই গান্ধীজি বলেন বন ও বন্য প্রাণী সংর(ণ এবং জীবসেবার মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের নীতি ও ধর্ম। এখানেই পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার সঙ্গে গান্ধীজির পার্থক্য। অ্যারিস্টটলের মতে, মানুষই ঈ(রের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং মানুষের প্রয়োজনেই জড় জগৎ ও জীবজগতের আর্বিভাব ঘটেছে। তাঁর মতে, উদ্ভিদের প্রয়োজনে আলো-বাতাস-জল-স্থল সমাকীর্ণ জড়জগৎ(পশুপাখীদের প্রয়োজনে উদ্ভিদজগৎ, আর মানুষের প্রয়োজনে প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও জড়জগৎ- সবকিছুই আবির্ভূত হয়েছে। খ্রীষ্টানরা মনে করেন, মানুষ কেবল তার স্রষ্টা ঈ(রের এবং তার প্রতিবেশীর কাছে দায়বদ্ধ, মনুষ্যতের প্রাণী বা উদ্ভিদের কাছে দায়বদ্ধ নয়। ঈ(রের বিধান অমান্য করা পাপ হলেও বৃ(লতা, পশুপ(ী হত্যা পাপ নয়।

পাশ্চাত্যের এই মতকে গান্ধীজি নীতি বিরোধী বলেছেন। ভারতীয় ধ্যান ধারনা অনুসরণ করে তিনি জগতের সকল কিছুকে স্বতঃমূল্যবান বলেছেন। উপনিষদে মধুময় ঈ(রের প্রকাশরূপে জগৎ মধুময়। গান্ধীজিও অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন, জগতের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মানুষের পরিমাণগত তারতম্য স্বীকার করা গেলেও গুণগত তারতম্য স্বীকার করা যায় না। কারণ জগতের সবই চৈতন্যস্বরূপ ঈ(রের প্রকাশ। তাই মানুষের উচিৎ কর্ম হল বন সংর(ণ করা, বন্য প্রাণী সংর(ণ করা। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করা চৌর্য বৃত্তির সমান। এগুলি নষ্ট করা যেমন আইনত দন্ডনীয় অপরাধ, তেমনি নীতিগতভাবে অন্যায়। অহিংসা মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক গান্ধীজি প্রাণীহত্যাকে দুঃখের সঙ্গে গ্রহন করলেও রসনা পরিতৃপ্তির জন্য এমন কি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রাণীহত্যাকে জঘন্যতম অপরাধ বলেছেন। প্রাণীহত্যাকে আত্মজন হত্যার সামিল বলেছেন, কারণ বি(েজগতের সব কিছুর মধ্য দিয়েই এক অদ্বয় সত্যের অর্থাৎ ঈ(রের প্রকাশ বলেছেন। তাঁর বি(োস এমন উপলব্ধি হলে মানুষ জীব হত্যা থেকে বিরত থাকবে।

মনুষ্য জগতেও বিভিন্ন মানুষ আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে এক সমগ্র মানব সমাজ তৈরি হয়, যার অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি(পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। মনুষ্য সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি(তার অস্তিত্বের জন্য, বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য একাধিক ব্যক্তি(র উপর নির্ভরশীল থাকায় তাদের প্রত্যেকের কাছে বিশেষভাবে ঋণী এবং সেই ঋণ শোধ করা অবশ্য কর্তব্য। গান্ধীজি এখানে প্রাচীন ভারতের মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্র(ান্ত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

এই কারণে প্রত্যেক মানুষই অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর ফলে, কোন মানুষ উন্নত হলে অপরাপর মানুষও উন্নত হয়। এজন্য গান্ধীজি বলেন, কোন মানুষ যদি অপরকে পদানত করে, অপমানিত করে, তাহলে সেই সঙ্গে নিজেই নিজেকে পদানত ও অপমানিত করে, কারণ ক(োময় ঈ(রের প্রকাশ রূপে সব মানুষ আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

ভারতীয় জাতপাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের মতো গান্ধীজিও বলেছেন, বৃহৎ শূদ্র শক্তি(কে অবহেলা করে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা কখনই উন্নত হতে পারে না। তাই তিনি হরিজন আন্দোলনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজি বি(োস করেন, মানুষের চরম ল(্য হল আত্মোপলব্ধি। অন্তস্থ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি, পরমসৎ ঈ(রের প্রকাশরূপে বি(ের সকল কিছুর সঙ্গে অর্থাৎ বি(মানবের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি। তিনি একেই বলেছেন ঈ(র উপলব্ধি। এই আত্মবিকাশের জন্য তিনি আত্মসেবার পরিবর্তে সমাজসেবার কথা বলেছেন। সত্যকে অর্থাৎ ঈ(রকে লাভ করতে হলে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়েই লাভ করতে হবে। সবার সেবার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হতে পারে। মানুষকে বাদ দিয়ে ঈ(র বলে আমার কাছে কিছু নেই। এই প্রকার উপলব্ধির জন্য কামনা-বাসনাকে জয় করে বিচার বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। বিষয় চিন্তার দ্বারা আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়।

আধ্যাত্মিক ভাবনায় পুষ্ট গান্ধীজি এজন্য বলেন, আত্মোপলব্ধি মানুষের প(ে সম্ভব হলেও সেই উপলব্ধির পথ সুগম নয়। ইন্দ্রিয় প্রধান ব্যক্তি('আমি' কে বিচার শক্তি(র দ্বারা বড় 'আমি'র বশীভূত করা এবং তাকে প্রসারিত ও পরিশুদ্ধ করা অতি কঠিন কাজ। আত্মোপলব্ধির জন্য আমার অন্তরবাসী ঈ(রই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, এমন উপলব্ধির জন্য যেমন ব্যক্তি(আমিকে নিয়ন্ত্রন করতে হবে তেমনি বড় আমিকে প্রসারিত করে বি(ময় পরিব্যাপ্ত করতে হবে, যেখানে ব্যক্তি(র স্বাধীনতা বলে আর কিছুই থাকে না, সে এক অকিঞ্চিতকর পদার্থে বা শূন্যে পরিণত হয়। এমন এক অবস্থাই হল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণতা বা আত্মোপলব্ধি। এমন অবস্থায় মানুষ তার নিজের স্বরূপ বুঝতে পারে - বি(েজনকে আত্মজনজ্ঞানে গ্রহন করে, প্রেম ও ভালোবাসাকে পাথেয় করে এবং অহিংসাকে অস্ত্র করে সমাজসেবায় অকুতোভয়ে সমস্ত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সত্যের প্রতি অবিচল ও ঐকান্তিক আগ্রহ-সত্যাগ্রহ। এজন্য গান্ধীজি প্রত্যেককে সত্যাগ্রহী হতে বলেছেন। সত্যাগ্রহীর জীবনে আত্মত্যাগ অনুশীলন করতে হয়, তাই তার কাছে তা বেদনাদায়ক হয় না। ত্যাগের মাধ্যমে অবশেষে আসে আত্মোপলব্ধির অনাবিল প্রশান্তি।

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের মতো গান্ধীজিও মানুষের প্রকৃতির মধ্যে দেবত্বের আবশ্যিক উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই মানব প্রকৃতিতে আবশ্যিক শুভত্বের বীজ নিহিত বলে তিনি মনে করেন। তাই কোন মানুষই প্রকৃত অন্যায়কারী হয়ে উঠতে পারে না । মানুষ ভ্রান্তির বশে যদি স্বার্থপর ও অন্যায় কাজ করে, তবু অহিংস পথে তার আত্মশুদ্ধি করতে হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মানুষের স্বরূপ প্রসঙ্গে গান্ধীজি উপনিষদের ভাবনাকে গ্রহন করেছেন। উপনিষদকে অনুসরণ করে সকল মানুষের মধ্যে ঈ(র ভাবের অনন্ত ঐ(র্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। তিনি স্পষ্টতই একথা বলেছেন " I believe in absoluet oneness of God and therefore also of humanity ... though we have many bodies, we have but one soul." মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে ঈ(র তা কখনোই দ্বৈত নয়, এক অদ্বৈত চিৎ শক্তি(ই

সর্বজীবে, সর্বমানুষে অন্তঃস্থিত। তাই মানবতাও খন্ড নয়, এক অখন্ড ঐক্য। মানুষে মানুষে প্রকৃতির নিয়মে ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেহের মধ্যে বিরাজমান আধ্যাত্মিক চেতন সত্তাটি অভিন্ন। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে সুপ্ত এই আধ্যাত্মিক ঐক্যই তাকে প্রতিটি কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক (ত্রে সমস্ত প্রচেষ্টাকে একসূত্রে গ্রথিত করে। তাই মানুষকে কখনোই দেব সর্বস্ব জীব বলে শুধুমাত্র চিহ্নি(ত করলে মানুষের বর্ণনা সঠিক হবে না। তার যেমন রয়েছে একটি আধ্যাত্মিক দিক যার দ্বারা সে সকল মানব জাতির সঙ্গে ঐক্যসূত্রে যুক্ত(, তেমনি রয়েছে দৈহিক যার মাধ্যমে সে সমাজে নানা কর্ম কান্ডে যুক্ত(হতে পারে। তবে সেই কর্মকান্ড অবশ্যই দৈহিক প্রবৃত্তির তাড়নায় হওয়া উচিৎ নয়, তাকে যদি আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নিয়ন্ত্রন করে তবেই সেই কর্মকান্ড সমাজে গ্রহনযোগ্য হয়ে উঠবে এবং সামাজিক কল্যাণ সম্ভব হতে পারে।

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ

— রেখা মৃধা, (দর্শন বিভাগ,2nd Sem.)

ভারতীয় আস্তিক দর্শনে এবং চার্বকে ছাড়া অন্যান্য নাস্তিক দর্শনে 'কর্মবাদ' একটি অতি গু(ত্বপূর্ণ তত্ত্ব। উক্ত(সমস্ত দর্শন একটি নিত্য, নৈতিক নিয়ম এ বি(্বাস করে যা অমোঘ এবং যে নিয়মের জন্য জগতে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা র(ি ত হয় এবং প্রতিটি মানুষ যার অধীন। বি(্ব প্রকৃতির শৃঙ্খলা যেমন একটি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত সেইরকম মানুষের কর্মজীবনের শৃঙ্খলা ও একটি নৈতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। বি(্ব প্রকৃতির শৃঙ্খলা যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় দর্শনে তাকে ঋত (rta) বলা হয়েছে। আর্যদের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ এই ঋত নামক বৈদিক শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এই নীতির জন্যই বি(্ব জাগতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা র(ি ত হয় এবং দেবতা, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ন(ত্রাদি ও সমস্ত প্রাণী এই নিয়মের অধীন। মানুষের কর্মজীবন যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় তার নাম 'কর্মবাদ'। বস্তুত বি(্ব-জাগতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার ভিত্তিরূপ ঋতই (Rta as comic and mral order) ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ বলে গন্য বা পরিচিত।

এই কর্মবাদের সাথে জন্মান্তরবাদ অঙ্গাঙ্গি ভাবে সম্বন্ধযুক্ত(। কেননা কর্মবাদ থেকে অনিবার্যভাবে জন্মান্তরবাদ নিঃসৃত হয়। জন্মান্তরবাদানুসারে বলা হয় মানুষ মৃত্যুর পর তার পূর্ব জীবনের সঞ্চিত কর্মের ফল ভোগ করার জন্য অবশ্যম্ভা বিরূপে পুনরায় জন্মগ্রহন করতে থাকে। কর্মবাদ বলে যে, কর্মের ফল বিনষ্ট হয় না। যে কর্ম (সকাম) করে, তাকে তার কৃত কর্মের ফল ভোগ করতেই হয়। এই নিয়মের ব্যতিত্র(ম নেই। কর্মের নিয়ম অমোঘ। মানুষ কর্ম না করে (ণকাল থাকতে পারে না। মানুষ যে রূপ কর্ম করে সেই রকম ফল ও ভোগ করে থাকে। কিন্তু মানুষের সমস্ত কর্মই তৎ(নাৎ ফল প্রদান করে না। কর্ম ভবিষ্যতে ফল প্রদানের অপে(ায় সঞ্চিত থাকতে পারে। এই সঞ্চিত কর্ম ইহজন্মে ও পরজন্মে ফল দান করতে পারে। কাজেই ইহজন্মে কোন ব্যক্তি(র কৃত কর্মের ফল ভোগ সম্পূর্ণ না হলে তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় পরজন্মে অতীতের সঞ্চিত কর্মের ফল ভোগ করার জন্য। ল(্য করা যায়, অনাদী কাল হতে মানুষের জন্মগ্রহণের ধারা অব্যাহত। কারণ কোন নিষ্কামকর্মকারী শক্তি(মানুষের প(ই তার অতীত জীবন ও ইহজীবনের সঞ্চিত কর্মের ফল ভোগ একটি জীবনে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। আর অন্যদিকে কর্মকর্তার

কর্মফল ভোগ থেকে নিস্তার নেই। সুতরাং কর্মফল ভোগের জন্য মানুষকে অবশ্যম্ভাবীরূপে পুর্নজন্মগ্রহণ করতে হয়। এভাবে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ কারণ কার্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আছে।

একমাত্র চার্বাক ছাড়া সব ভারতীয় দার্শনিকরা বলেন, কর্মবাদ স্বীকার না করলে বিভিন্ন মানুষের জীবনের মধ্যে যে পার্থক্য, তা ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন মানুষ সুখী, আবার কোন মানুষ দুঃখী, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র। প্রশ্ন হতে পারে এরূপ বৈষম্য হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেও নিহিত রয়েছে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের সম্বন্ধগত বিষয়টি। উক্ত সমস্ত বৈষাম্য মানুষের বর্তমান জীবনের জ্ঞাত তথ্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমরা দেখি যে, এই জগতে ধার্মিক ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করে, আবার অধার্মিক ব্যক্তি সুখ ভোগ করে। জাগতিক জীবনের এই বৈচিত্র এবং বিশৃঙ্খলা বর্তমান জীবনের কর্মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য। মানুষের জীবনের কিছু কিছু ঘটনা তার বর্তমান জীবনের কর্মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। কিছু কিছু ভাল বা মন্দ কর্ম যখন এই জীবনেই যথাক্রমে ভাল বা মন্দ ফল উৎপন্ন করে, তাহলে একথা বলা যুক্তিসঙ্গত যে, সমস্ত কর্মই ব্যক্তির বর্তমান বা ভবিষ্যৎ জীবনে ফল উৎপন্ন করবে। একে বলে নৈতিক কার্য কারণবাদ। সুতরাং বলা যায়, বর্তমান জীবনে ধার্মিক ব্যক্তির যে দুঃখভোগ তা তার অতীত জন্মের কর্মের জন্য বা কোন অসৎ কর্মজনিত ফল যার ভোগ অতীত জীবনে অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে বর্তমান জীবনে অধামির্ক ব্যক্তিরযে সুখভোগ তা তার অতীত জীবনে সঞ্চিত সৎকর্ম জনিত ফল যার ভোগ অতীতে সম্পূর্ণ হয়নি। সুতরাং কর্মবাদ ও তার ফলস্বরূপ জন্মান্তরবাদ স্বীকার না করলে জীবনের উক্তরূপ বৈচিত্র ব্যাখ্যা করা যাবে না।

প্রসঙ্গত এ বিষয়ে আরোও বক্তব্য এই যে বুদ্ধদেব কর্মবাদ মেনেছেন এবং কর্মফল ভোগের জন্য জীবের পুর্নজন্ম গ্রহণ করার কথা অর্থাৎ জন্মান্তরবাদ ও মেনেছেন। তবে তাঁর ব্যাখ্যা একটু অন্যরূপ। বুদ্ধদেব নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে জন্মান্তর হল ইহজীবন থেকে পরজীবনে উত্তরণ, জন্মান্তরের তাৎপর্য এই নয় যে, নিত্য আত্মার নবদেহ ধারণ। জীবের মানসিক প্রক্রিয়াই ইহজীবন থেকে পরজীবনে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ কর্মকর্তা প্রথম ক্ষণে কর্ম উৎপাদন করার পর যখন দ্বিতীয় ক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় ক্ষণে একটি সদৃশ আত্মার উৎপত্তি হয়, এবং ঐ সদৃশ আত্মাতে কর্মের ফলটি ক্রমশঃ পরিবাহিত হয়। এই দ্বিতীয় আত্মা প্রথম আত্মার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। বস্তুতঃ পূর্বজন্ম ও পরজন্মের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। আর এই যোগসূত্র স্থাপন করে চলেছে কর্মফলবাদ।

এইভাবে উপরোক্ত আলোচনাসমূহের মাধ্যমে দেখা গেল যে জন্মান্তরবাদকে ব্যাখ্যা করা যাবে না, যদি না কর্মবাদ স্বীকার করা হয়। আবার জন্মান্তবাদকে অস্বীকার করে কর্মবাদ স্বীকারের কোন যৌক্তিকতা থাকে না। কারণ কর্মবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল জন্মান্তরবাদ। সুতরাং কর্মবাদ এবং জন্মান্তরবাদ একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত।

জ্ঞানের ে ত্রে সংবেদবৃত্তি ও বোধশক্তি(র ভূমিকা ঃ কান্ট

— রানা বর্মন, (দর্শন বিভাগ,4th Sem.)

জ্ঞানের উৎপত্তি প্রসঙ্গে সংবদনবৃত্তি (Sinsibility) ও বোধশক্তি(র (Understanding) সম্বন্ধ নিরূপন করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে, জার্মান দার্শনিক ইম্মানুয়েল কান্টের মতে সংবেদনবৃত্তি ও বোধশক্তি(র মধ্যে প্রধান সদৃশ্যটি হল উভয়ই জ্ঞানের উৎস হাওয়ায় এই দুটিকেই জ্ঞানীয় বৃত্তি বলা হয়। কান্ট বলেছেন, এই দুটির মধ্যে কোনো একটি এককভাবে জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে না। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে কোন বিষয়ের জ্ঞান হয়। সংবেদনবৃত্তি বহির্জগৎ থেকে জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে এবং বোধশক্তি(সেগুলিকে সাজিয়ে জ্ঞানের আকার প্রদান করে।

সংবেদনবৃত্তি হল নিষ্ি(য়বৃত্তি। কেননা বাইরের থেকে কোনকিছু গ্রহন করার ব্যাপারে কোন সক্রি(য়তা তার থাকে না, কিন্তু গ্রহণ করার একটা (মতা তার থাকে। জগৎ থেকে জ্ঞানের বিষয় বা উপাদান সমূহ যখন সংবেদনবৃত্তির দ্বারা গৃহীত হয় তখন জ্ঞানের উপাদানগুলি থাকে বিশৃঙ্খল ও অসংবদ্ধ। তাই বিষয়টার প্রকৃতি কেমন হবে তা নির্ধারণের (মতা সংবেদনবৃত্তির থাকে না। আর এই কাজটাই করে বোধশক্তি(অর্থাৎ সংবেদনবৃত্তিতে এসে পড়া বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল, অসংবদ্ধ জ্ঞানীয় উপাদান বা বিষয়গুলি কেমন হবে যে বিষয়ে চিন্তা করে বোধশক্তি(এবং এই বিশৃঙ্খল বিষয়গুলির সুশৃঙ্খলতা প্রদান করে বোধশক্তি(ই। এইজন্যই বোধশক্তি(হল সক্রি(য়বৃত্তি।

জ্ঞানীয় উপাদান গ্রহণ করার ব্যাপারটা নিষ্ি(য়। আর সেই গৃহীত উপাদান সম্বন্ধে চিন্তার বিষয়টি সক্রি(য়। সংবেদনবৃত্তির মাধ্যমে পাই অনুভব। কিন্তু ঐ অনুভব গ্রহণ করার ব্যাপারে তাকে কোন সক্রি(য় ভূমিকা পালন করতে হয় না। আমরা চাই বা না চাই বিষয়ের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই। আর প্রভাবের ফলে অনুভব হবেই। সংবেদনবৃত্তি বা সংবেদনশক্তি(র ে ত্রে এটা আবশ্যিক যে, বাইরের উৎসস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন জ্ঞানীয় উপাদানসমূহ সংবেদনবৃত্তিতে উপস্থিত হলেই সংবেদনবৃত্তি সেগুলিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। এ(ত্রে বিচ্ছিন্ন উপাদানসমূহ সংবেদনবৃত্তির নিজস্ব পূর্বতসিদ্ধ দুটি আকার যথা দেশ ও কালের দ্বারা আকারিত হয়ে দৈশিক ও কালিকরূপে সংবেদনবৃত্তিতে এসে পড়ে। তাই অনুভব মাত্রই দেশ ও কালের আকারে আকারিত হয় বা অভিজ্ঞতার বস্তুমাত্রই দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধে অনুভূত হয়। অর্থাৎ এমন কোন বস্তু আমাদের প্রত্য(হয় না যা কোন স্থান (দেশ) অধিকার করে থাকে না, যার কোন স্থায়িত্ব (কাল) নেই। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল এই অনুভবের বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করা সংবেনবৃত্তির কাজ নয়। যখন সংবেদনবৃত্তির মাধ্যমে বিষয়ের অনুভব হয় তা সুসংবদ্ধ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে না। কান্টের মতে এগুলি হল বিচ্ছিন্ন সংবেদনরাশির জটলা (a collection of isolated sensation) । বোধশক্তি(বিচ্ছিন্ন অনির্দিষ্ট অনুভবরাশির উপর তার শুদ্ধ প্রত্যয় (Pure categories of Understanding) প্রয়োগ করে অনুভবগুলিকে একত্র করে জ্ঞানের আকারে আকারিত করে।

কান্টের মতে বোধশক্তি(র নিজস্ব ১২টি শুদ্ধ প্রত্যয় রয়েছে। এগুলির সাহায্যেই বোধশক্তি(সংবেদনবৃত্তিতে গৃহীত বিচ্ছিন্ন অনুভবগুলিকে একত্র ও সুসংবদ্ধ করে। ঠিক যেমন সংবেদনবৃত্তির নিজস্ব দুটি আকার দেশ ও কাল ব্যাতীত সংবেদনবৃত্তিতে কোন অনুভব উৎপন্ন হয় না তেমনি বোধশক্তি(র ১২টি

শুদ্ধ প্রত্যয় ব্যাতীত সংবেদনবৃত্তিতে গৃহীত বিষয় সম্বন্ধে কিছু চিন্তাই করা যায় না।

কান্ট বলেন সংবেদনবৃত্তি ও বোধশক্তি(এই দুটি জ্ঞানীয় বৃত্তির কোন একটিকে অন্যটির থেকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া যায় না। দুটি বৃত্তি উভয় উভয়ের পরিপূরক। কেননা দেশ ও কালের কাঠামোতে যেসব বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয় সংবেদন লাভ করা হয় তাদের যদি সমন্বিত না করা যায়, তবে সেগুলি অর্থহীন থেকে যায়। ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আর এই সমন্বয়ের কাজটাই করে বোধশক্তি(। কাজেই বুদ্ধির মধ্যস্থতা ব্যাতিরেকে নিছক সংবেদন আকারহীন অর্থহীন তথ্যমাত্র। বুদ্ধির মধ্যস্থতায় বিচ্ছিন্ন সংবেদন অর্থময় ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় বা উপাদান না থাকলে মন বা বুদ্ধিবৃত্তি সমন্বিত করার কিছুই পাবে না। অর্থাৎ সংবেদনবৃত্তি যদি বহির্জগৎ থেকে জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ না করে তবে বোধশক্তি(তার শুদ্ধ প্রত্যয়গুলি (দ্রব্য-গুণ, কারণ-কার্য, অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব প্রভৃতি) আরোপ করার কিছুই পাবে না। ফলে সেগুলি শূন্যে অবস্থান করে। এমতাবস্থায় জ্ঞানের প্র(েই ওঠে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জ্ঞানীর বৃত্তি দুটি সম্পূরক ও পরস্পর নির্ভর। চিন্তন কখনো দেখতে পায় না। আর ইন্দ্রিয় কখনো চিন্তা করতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উপাদান যোগায়, আর বুদ্ধি সে-সব উপাদানকে আকার প্রদান করে সেগুলির অর্থপূর্ণ জ্ঞানের রূপ দেয়। তাই আকার বর্জিত উপাদান (যা সংবেদনবৃত্তির দ্বারা গৃহীত) সুনির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ কোন কিছু নয়, আবার উপাদান বর্জিত আকার (বোধশক্তি(র শুদ্ধ প্রত্যয় সমূহ) নিছক শূন্য। অর্থাৎ বুদ্ধির প্রত্যয় ব্যতীত বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভব অর্থহীন সংবেদন জটলা, আর ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রত্যয়সমূহ বস্তু শূন্য, শূণ্যগর্ভ। কান্টের এই অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে ফল্‌কেনবার্গ বলেছেন "Intuitions without concepts are blind and concepts without intuition are empty " অর্থাৎ বোধশক্তি(র প্রত্যয়সমূহ ছাড়া ইন্দ্রিয়ানুভব অন্ধ (অর্থাৎ অর্থহীন) এবং ইন্দ্রিয়ানুভব বা সংবেদনবৃত্তিতে গৃহীত দৈশিক ও কালিক বিচ্ছিন্ন উপাদানসমূহ ছাড়া বুদ্ধির বিশুদ্ধ প্রত্যয়সমূহ শূণ্যগর্ভ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংবেদনবৃত্তি নিজে থেকে জ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে না পারলেও এই বৃত্তির জন্যই বাহ্যজগতের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে যেটা বোধশক্তি(র দ্বারা অসম্ভব। আবার বাহ্যজগতের বিষয়গুলি কেমন তা জানার জন্য বোধশক্তি(র উপর নির্ভর করতেই হয় যেটা আবার সংবেদনবৃত্তির দ্বারা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গেই কান্ট বলেছেন, জ্ঞান কেমন করে হয় তা বুঝতে হলে এই দুটি জ্ঞানীয় বৃত্তির ভূমিকাকে মিলিয়ে ফেললে হবে না, পৃথক পৃথক ভাবে দুটি স্তরে পা রেখে তা বুঝতে হবে। প্রাথমিক স্তরে সংবেদনবৃত্তির ভূমিকাকে জানতে হবে এবং দ্বিতীয় স্তরে বোধশক্তি(র ভূমিকাকে জানতে হবে।

মন্তব্য ঃ কান্ট গুনগত দিক থেকে জ্ঞানের ((ত্রে সংবেদনবৃত্তি ও বোধশক্তি(র ভিন্নধর্মী ভূমিকাকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে সংবেদনবৃত্তি হল ইন্দ্রিয়বেদ্য বৃত্তি। আর বোধশক্তি(হল অতীন্দ্রিয় বেদ্যবৃত্তি এবং তিনি জ্ঞানের উৎপত্তির ((ত্রে এই দুটি বৃত্তিকেই সমান প্রাধান্য দেন। কিন্তু তাঁর পূরসুরীরা যথা অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী বিভিন্ন দার্শনিক তাঁর মত করে এই দুটি বৃত্তির মধ্যে তুলনা করেননি। বরং তারা পরিমানগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংবেদনশক্তি(ও বোধশক্তি(কে দেখেছেন। অর্থাৎ বলা যায় জ্ঞানীয় উৎকর্ষতার মাত্রাগত দিকটি তাঁদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতাবাদীদের দাবী হল - জ্ঞানের দৃষ্টিটা যতই ইন্দ্রিয়নুভবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে ততই জ্ঞান স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হবে, আর যতই ইন্দ্রিয়ানুভবকে অতিত্র(ম করে বা তাকে প্রাধান্য না

দিয়েই জ্ঞানের অনুসন্ধান করা হয় জ্ঞান ততই অস্পষ্ট হয়ে পড়বে।

অন্যদিকে বুদ্ধিবাদীদের মূল দাবী হল মন বা বুদ্ধি যা চিন্তা করে তাই আসল, জ্ঞানলাভের পথে সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম বা উৎস হল চিন্তনক্রি(য়া বা বোধশক্তি(। তাই জ্ঞানীয় দৃষ্টিটা সর্বদাই বুদ্ধিকেন্দ্রিক হতে হবে। বৌদ্ধিক জ্ঞানই স্পষ্ট ও প্রমাত্মক। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান অস্পষ্ট ও অপ্রমাত্মক।

দার্শনিক কান্টই প্রথমে উক্ত(দুই বি(দ্ধ মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে আপাত বিরোধমুক্ত(একটা মতবাদ (বিচারবাদ) প্রনয়ণ করেন। তিনিই প্রথম বলেন, ইন্দ্রিয়ানুভব ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে যে একটা জাতিগত ও গুনগত পার্থক্য রয়েছে তা অভিজ্ঞতাবাদী বা বুদ্ধিবাদীদের কেউই খেয়াল করেননি। তাঁর দর্শনেই প্রথম এই অতি সত্যের জায়গাটার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এজন্যই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে কান্টের জ্ঞানতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছে।

সাধারণ ধর্ম ও বিশেষ ধর্মঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা

— প্রসেনজিৎ গাইন, (সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ)

ভারতীয় শাস্ত্রে মানবজীবনের একাধিক আদর্শের বা মূল্যের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি মানুষের অভীষ্ট বা কাম্য এবং যেগুলিকে মানবজীবনের ল(্য বা উদ্দেশ্যরূপে চিহ্নি(ত করা হয়েছে। এগুলিকে একত্রে পু(ষার্থ বলা হয়েছে। ভারতীয় শাস্ত্রে সাধারণত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মো(এই চারটি পু(ষার্থের উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে ধর্ম শ্রেষ্ঠ্য পু(ষার্থ মো(বা মুক্তি(লাভের ে(ত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে বলে ধর্মকে পু(ষার্থের পরিকল্পনায় মূল ভিত্তিরূপে স্থান দেওয়া হয়েছে।

এখন প্র্ন হল ধর্ম কী? প্রথমেই মনে রাখতে হবে পু(ষার্থের অন্তর্গত 'ধর্ম' আর পাশ্চাত্যের religion এক নয়। ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম বলতে এমন কিছু সদাচার বা সুনীতি বোঝায় যা ব্যক্তি(গত ও সামাজিক জীবনে অবশ্য পালনীয়। 'ধৃ' ধাতু থেকে 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধারণ করা'। যা বি(্বকে ধারণ করে আছে, যা সমগ্র বি(্বের শৃঙ্খলাকে র(া করে তাই ধর্ম। অর্থাৎ বলা যায় ধর্ম হল তাই যা মানুষ ও সমাজকে ধারণ করে। তাই ভারতীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী ব্যক্তি(ও সমাজের অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতার জন্য ধর্মপালন করা কর্তব্য। কর্তব্যের অমর্যাদা মানব সমাজকে ধ্বংস করে। ধর্ম আসলে এক সামাজিক বিধি বা সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা বর্ণের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি স্থাপন করে থাকে। ধর্মের এই সামাজিক তাৎপর্যের পাশাপাশি একটি নৈতিক তাৎপর্য ও আছে। ধর্ম একটি নৈতিক বিধি যা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি তাকে সমাজকল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে। আর সমাজকল্যাণের মধ্যেই মানুষের শুদ্ধি ঘটে। মানুষের বিভিন্ন আচরণের ে(ত্রে ধর্মই নিয়ন্ত্রক। যেমন কাম ও অর্থ যদি ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে মানুষ বিপথগামী হতে পারে। ফলে সমাজকল্যাণ বিঘ্নিত হতে পারে। নিষ্ঠার সাথে ধর্মপালন থেকে বিরত থাকলে চারিত্রিক শুদ্ধি নিতান্তই অসম্ভব। ফলে মুক্তি(র পথ (দ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। সহজ কথায় ধর্মকে উপে(া করে অর্থ বা কাম, এমনকি মো(র ও সাধনা করা যায় না। সুতরাং পু(ষার্থ সমূহের ভিত্তি স্বরূপ 'ধর্ম' যে অবশ্যপালনীয় তা অনস্বীকার্য।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে দুপ্রকার ধর্মের উল্লেখ আছে ঃ সাধারণ ধর্ম এবং বিশেষ ধর্ম বা বর্নাশ্রম ধর্ম যাকে স্বধর্ম ও বলা হয়।

সাধারণ ধর্ম ঃ ধর্ম, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের (ে ত্রে যে ধর্মগুলি অবশ্যই পালনীয়। সেগুলি সাধারণ ধর্ম। এইরূপ ধর্মে গৃহীত নৈতিক আদর্শগুলি সম্পূর্ণভাবে আশ্রমনিরপে(, বর্ণ নিরপে(। অর্থাৎ এ(ে ত্রে নৈতিক কর্তব্য বিচারে মানুষের বিশেষ কোন সামাজিক অবস্থান বিচার্য্য নয়।

মনুসংহিতায় যে সকল সাধারণ ধর্মের উল্লেখ রয়েছে সেগুলি হল - ধৃতি, (মা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অত্রে(াধ।

ধৃতি বলতে নিজের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা বোঝায়। অপরাধীর মধ্যে অনুশোচনাবোধ জাগ্রত করে তার আচরণের সংশোধনের জন্য অপরাধ মার্জনাই (মা, দম - সহনশীলতাকে নির্দেশ করে, অন্যের দ্রব্য অপহরণ না করাই অস্তেয়, শৌচ হল দৈহিক ও মানসিক শুচিতার নির্দেশক, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রনে রাখাই হল ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী হল বিচারশক্তি(অর্থাৎ জ্ঞান বা বুদ্ধি, বিদ্যা হল আত্মজ্ঞান, যেকোনরূপ মিথ্যা (নিন্দা করা, বি(াসঘাতকতা করা, প্রতারণা করা, অনিষ্ট করা) থেকে বিরত থেকে সকল জীবের কল্যাণকর চিন্তা ও তার প্রয়োগ হল সত্য এবং অত্রে(াধ হল ত্রে(াধশূন্যতা।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে ও কিছু সাধারণ ধর্মের উল্লেখ আছে, যথা - অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দম, দয়া প্রভৃতি।

ল(করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি সাধারণ ধর্ম বা কর্তব্যই ব্যক্তি(র শুদ্ধির জন্য অবশ্যই পালনীয়। যদি ও ভারতীয় নীতিবিদ্যায় সমাজের উন্নতি সরাসরি ল(করে এই ধর্মগুলিকে আচরনীয় বলা হয়নি তবুও এগুলির পালন যে সামাজিক উৎকর্ষতার জন্য আবশ্যিক তা অস্বীকার করা যায় না। মনে হয় যে ভারতীয় দর্শনে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারের রচনায় ব্যক্তি(মানুষের আত্মিক উন্নতি বা শুদ্ধিই তত সর্বাধিক গু(ত্ব পেয়েছিল। নিষ্ঠা, ইন্দ্রিয় সংযম, সহনশীলতা, অহিংসা, সত্য আচরণ প্রভৃতি ধর্মের তাৎপর্য্যের মধ্যেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত(ধর্মপালনের জন্য সংকল্প থাকা একান্ত আবশ্যক। নচেৎ বিবিধ কর্ম থেকে বাহ্য আচরণকে নিবৃত্ত করে অধর্ম পরিহার করা গেলেও, ধর্ম উৎপন্ন করা যায় না। যেমন অহিংসা শুধুমাত্র হিংসাভাব নয় অর্থাৎ হিংসা থেকে নিবৃত্ত হওয়াই অহিংসার অর্থ নয় বরং প্রাণী সমূহকে আঘান না করার সংকল্পই প্রকৃত অহিংসা ধর্ম। অনুরূপভাবে চোর্য থেকে বিরত থাকা অস্তেয়ের সম্পূর্ণ অর্থ নয়, বরং অস্তেয় একপ্রকার সংকল্পকে বোঝায় যার অর্থ অপহরণ করা আমার কর্তব্য নয়।

বিশেষধর্ম ঃ- স্বধর্ম বা বিশেষধর্মগুলি প্রত্যেকটি মানুষের অবশ্যই পালনীয় কোন সার্বজনীন কর্তব্য নয়। এগুলি মনুষ্য জীবনের নানান স্বভাব ও বিবিধ সামাজিক অবস্থান বা পর্যায় সাপে(। বিশেষ ধর্মগুলি দুই প্রকার - ক) বর্ণধর্ম অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের উপযোগী কর্তব্যসমূহ এবং খ) আশ্রমধর্ম অর্থাৎ বিভিন্ন আশ্রমের উপযোগী কর্তব্যসমূহ।

বর্ণধর্ম ঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ত্রিগুন (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) থাকলেও সকলের মধ্যে একইগুণ প্রধান নয়। গুনের এই তারতম্যের ভিত্তিতে বৈদিক শাস্ত্রে সমাজের মানুষকে ব্রাহ্মন, (ত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র - এই চতুর্বনে ভাগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মন সত্ত্ব প্রধান, (ত্রিয় ও বৈশ্য মূলতঃ রজঃপ্রধান এক শুদ্র তমঃ প্রধান। গুণের এই প্রাধান্য ভেদের ভিত্তিতে প্রতিটি বর্ণের মানুষের ধর্ম (কর্তব্য) নির্ধারিত হয়েছে। এই ধর্মগুলি হল বর্ণ ধর্ম। যেমন — ক) **ব্রাহ্মণের পালনীয় ধর্ম** - যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যাপনা, পরিগ্রহ (দানগ্রহন)।

খ) **(ত্রিয়ের পালনীয় ধর্ম ঃ** প্রজাপালন, অসাধু নিগ্রহ, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া।

গ) **বৈশ্যের পালনীয় ধর্ম ঃ** বাণিজ্য, কৃষিকর্ম, পশুপালন প্রভৃতি বৈষয়িকত্রি(য়া।

ঘ) **শূদ্রের পালনীয় ধর্ম ঃ** অন্য বর্ণভুক্ত(মানুষের সেবা ও পরিচর্যা।

বর্ণধর্মগুলি ল(্য করলে দেখা যাবে যে, ধর্মসমূহের সামাজিকমূল্য অপরিসীম। কেননা সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন যদি বিচার করা হয় তবে দেখা যাবে যে, মানুষের চতুবিধ বর্ণের মত সমাজের প্রয়োজনও চতুর্বিধ। সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে তাকে সুরি(ত রাখতে হবে, তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে হবে, তাকে সেবা ও যথাযথ পরিচালনা করতে হবে। বিভিন্ন বর্ণের যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত ধর্ম বা কর্তব্য সমাজের এই বিভিন্ন দাবীকে পূর্ণ করতে স(ম।

আশ্রম ধর্ম ঃ- 'আশ্রম' শব্দটি জীবনের এক একটি অধ্যায়কে বোঝায়। বৈদিক শাস্ত্রে মানুষের সমস্ত জীবনকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস - এই চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত(করা হয়েছিল। এই চারটি আশ্রম ল(্য করলেই বোঝা যাবে যে মো(লাভকেই মানবজীবনের চরম ল(্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। চারটি আশ্রমের পালনীয় কর্তব্যগুলি অর্থাৎ আশ্রম ধর্মগুলি সম্পন্নের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন জৈব সত্তা থেকে পারমার্থিক সত্তায় উত্তীর্ণ হয়। ব্রহ্মচর্য হল অধ্যয়ন ও সংযম অভ্যাসের কাল। অর্থাৎ এই আশ্রমে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে শিষ্যকে গু(গৃহে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যায়ন করতে হয়। সুতরাং এই আশ্রমে আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে চরিত্র বন্টন হয় এবং প্রকৃত শি(া লাভ হয়। ব্রহ্মচারীর সংযত জীবনে প্রাণশক্তি(র স্ফুরণ ঘটানো এই আশ্রমের মূল শি(া। গৃহাশ্রমে বিবাহিত জীবন বা সংসার জীবনকে গার্হস্থাশ্রম বা কৃতদাহ গার্হস্থ বলা হয়। এই আশ্রমে প্রবেশ করে মানুষ ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহন করে। বংশধারাকে অব্যাহত রেখে মানবজাতির প্রবাহকে অ(ুন্ন রাখা গার্হস্থাশ্রমের কর্তব্য। এছাড়া গার্হস্থ আশ্রমেই মানুষ দেবধান, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ প্রভৃতি পরিশোধ করে।

বানপ্রস্থ বা অরণ্যের নির্জনবাস জীবনের সেই অন্তিমপর্ব যা সন্ন্যাসের প্রস্তুতিকাল। বানপ্রস্থে মানুষ যেন স্বেচ্ছা নির্বাসনে যায়। এই আশ্রমে শয্যা হল কেবল ভূমি, গাত্রচর্ম ও কুশতৃণ হয় পরিধান এবং এই সময় দেবতা ও অতিথিদের সেবা, বেদ অধ্যায়ন এবং একান্ত ধৈর্য সহকারে যজ্ঞ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। এই আশ্রম গার্হস্থ্যাশ্রম থেকে সন্ন্যাসাশ্রমে উত্তরণের স্তর এবং সবকিছু ত্যাগের প্রস্তুতিকাল।

জাগতিক বস্তুর প্রতি বৈরগ্যই সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের যোগ্যতা। সর্বভূতে দয়া, কামনা-বাসনা থেকে মুক্তি(, সুখ-দুঃখে, লাভ-লোকসানে সমত্ববোধ, শত্রু-মিত্রের প্রতি সমমনোভাব এই আশ্রম জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই আশ্রমে সন্ন্যাসী কায়িক, বাচিক ও মানসিক হিংসা পরিত্যাগ করে উপনিষদ বা বেদ অধ্যয়ন এবং সর্বদা আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন থাকেন।

উক্ত(আশ্রম ধর্মগুলি পরিকল্পনার ভিত্তি যে নৈতিক নিয়ম তাহল - 'দেহাদির ও জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি(লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি(র আশ্রম নির্দিষ্ট কর্তব্য সমূহ যথাযথভাবে পালন করা উচিত।

উপরোক্ত(আলোচনার ভিত্তিতে সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে সে তুলনামূলক আলোচনা নিঃসৃত হয় তা নিম্নরূপ ঃ-

প্রথমতঃ বলতে হয় স্বধর্ম পালনের জন্য সামান্য ধর্মকে লঙ্ঘন করার কোন প্রয়োজন নেই। তার কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের এমন কতকগুলি সম্পর্ক আছে যাকে কোন বিশেষ ধর্মের স্বার্থেই বিসর্জন দেওয়া যায় না। বরং সামান্য (সাধারণ) ধর্মকেই বিশেষ ধর্মের ভিত্তি বলা চলে। সাধারণ ধর্ম সেই সীমার নির্দেশ দেয় যার মধ্যে স্বধর্ম পালন করা চলে।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য দুই ধর্মের মধ্যে সবথেকে গু(ত্বপূর্ণ পার্থক্য হল সাধারণ ধর্মের পরিকল্পনা সকলের জন্য কতকগুলি সার্বিক নৈতিক নিয়মের নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ এই ধর্মগুলি সমাজস্থ সকল মানুষের (ত্রে

প্রযোজ্য। কিন্তু স্বধর্মের পরিকল্পনা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কর্তব্যসমূহের নির্দেশ দেয় যা বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও আশ্রমভুক্ত(মানুষদের (ে ত্রে প্রযোজ্য। কাজেই বর্ণাশ্রম ধর্ম হল মানবজীবনের নানা অবস্থান ও পর্যায় সাপে(। কিন্তু সাধারণ ধর্ম তদ্‌নিরপে(।

তৃতীয়তঃ পূর্বের বক্তব্যের অনিবার্য নিঃসৃতি হলঃ সাধারণ ধর্মগুলি সকল মানুষের সার্বজনীন কর্ত্তব্য। এখানে জাতি, বর্ণ আশ্রম অর্থাৎ মানুষের সামাজিক অবস্থানের কোন প্রসঙ্গ নেই। অন্যদিকে বর্ণাশ্রম ধর্মগুলি মানুষের সার্বজনীন কর্তব্য নয়। বিশেষ বিশেষ মানুষের স্বভাব, সামাজিক অবস্থান এবং জীবনের নানা পর্যায় ভেদে বিশেষ ধর্মগুলি (বর্নাশ্রম ধর্ম) নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ বর্ণ ও আশ্রম ধর্মগুলির প্রতিটি অঙ্গে সামাজিক মূল্য অপরিসীম। কেন না প্রত্যেকটি বর্ণ ও আশ্রম ভুক্ত(মানুষ তাদের নির্ধারিত ধর্ম বা কর্তব্য সমূহ পালনের মধ্য দিয়ে সমাজকে সুর(ত করে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে। অন্যদিকে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে সমাজের কল্যাণে সাধারণ ধর্মগুলির পালনের কথা বলা হয়নি। বরং এই ধর্মের ল(্য ছিল আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ ধর্মগুলি আত্মমুখী। অবশ্য সাধারণ ধর্মগুলিকে প্রতিটি মানুষ যথাযথভাবে পালন করলে সমানে শৃঙ্খলতা আসে তা অস্বীকার্য্য নয়। তবে সাধারণ ধর্মগুলির ব্যক্তি(গত মূল্য ও নৈতিকমূল্য বেশী। অপরপ(ে বর্ণাশ্রম ধর্মগুলির সামাজিক মূল্য বেশী।

পঞ্চমতঃ স্বধর্মগুলি মানুষের বৃত্তিগত দায়বদ্ধতা। প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও আশ্রমভুক্ত(মানুষকে সেই সেই বর্ণ বা আশ্রম নির্দেশিত ধর্মগুলিকে অবশ্য কর্তব্য বলে মানতে হয়। বলা যায় এইরূপ দায়বদ্ধতার মূল তার স্বভাবগত দ(তার মধ্যে নিহিত। কিন্তু সাধারণ ধর্মগুলি এরূপ কোন ব্যক্তি(সাপে(ে বৃত্তিগত দায়বদ্ধতা নয় বরং তা সকল মানুষের (ে ত্রে সমভাবে প্রযোজ্য এবং সেগুলি পালন করা না করা তাদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

ষষ্ঠতঃ পূর্বের দুটি পার্থক্যের ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে, বিশেষ ধর্মগুলি মূলতঃ সামাজিক কর্তব্যবোধে পালন করা হয়। কিন্তু সাধারণগুলি মূলতঃ সৎসংকল্পের দ্বারা চালিত হয়ে আত্মশুদ্ধির বা চরিত্রসাধনের উদ্দেশ্যে পালিত হয়। উল্লেখ্য বর্ণাশ্রমধর্মগুলি পালনেও চরিত্রগঠন হয়।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, বর্ণ ও আশ্রমের দ্বারা বিশেষ বিশেষ বর্ণের ও বিশেষ বিশেষ আশ্রমের মানুষের অধিকার নির্ধারিত হয়। যেমন (ত্রিয় বর্ণান্তগত মানুষের অধিকার আছে যুদ্ধে বা স্বদেশ সুর(ত রাখায় এবং বৈশ্যের অধিকার আছে ব্যবসা-বাণিজ্যে। তাই এগুলিই তাদের স্বধর্ম। কিন্তু সাধারণ ধর্মের (ে ত্রে এরূপ বিশেষ অধিকারের কথা ব্যক্ত(হয় নি।

সবশেষে আলোচ্য দুটি ধর্মের পার্থক্য প্রসঙ্গে সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মকে কেন্দ্র করে একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহল কখনও কখনও সাধারণ ধর্ম ও বর্নাশ্রম ধর্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হতে পারে। সে(ে ত্রে মানুষের প(ে কোনটি পালনীয় তার সঠিক নির্দেশ পাওয়া কঠিন। যেমন, কৈকেয়ী রামকে বনবাসে প্রেরণ করায় এবং ভরতের সিংহাসন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করলে লক্ষ্মন সত্রে(াধে বলেন যে, রামের সিংহাসন যদি অন্য কেউ অধিকার করে তাহলে তিনি তাকে হত্যা করবেন। রাম তখন তাঁকে বর্ণ ধর্ম পালন করতে নিষেধ করেন অর্থাৎ তিনি অগ্রজের সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করার জন্য (ত্রিয়ের মত শৌর্য প্রদর্শনে উদ্যত হলে রাম তাঁকে সাধারণ ধর্ম পালনে নির্দেশ দেন। সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী পিতৃ-সত্য পালন করাই পুত্রের ধর্ম। এইভাবে এখানে রাম বর্নাশ্রম ধর্মের তুলনায় সাধারণ ধর্মকেই বলবান বলে উল্লেখ করেন।

আবার গীতায় দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ(অর্জুনকে যুদ্ধযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছেন কারণ যুদ্ধই (ত্রিয়ের বর্ণ ধর্ম বা স্বধর্ম। কিন্তু অর্জুনের মতে আত্মীয়দের বি(দ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম ((মা, দম, ধী,অত্রে(াধ) লঙ্ঘন করা হয়। কিন্তু এ(ে ত্রে শ্রীকৃষ(সাধারণ ধর্মের তুলনায় বর্ণ ধর্মকেই বলবান বলে উল্লেখ করেছেন।

কাজেই বোঝা যায় না যে, কোন ধর্মের উৎকর্ষতা বেশী অর্থাৎ কোনটি বেশী প্রয়োজনীয। গীতায় ও এ বিষয়ে অর্থাৎ উত্ত(রূপ বিরোধের নিষ্পত্তির কোন উপায়ের নির্দেশ পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় যে, পরিস্থিতি সাপে(ে একটি ধর্ম উৎকর্ষতার দৃষ্টিতে অপর ধর্মকে অতিত্র(ম করে যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ

— অরবিন্দ সেন, (শি(ক, দর্শন বিভাগ)

প্রাচ্যের যে কয়েকজন মনীষীর চিন্তাধারায় মানবতাবাদী বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে অন্যতম। পারিবারিক সূত্রে তিনি জীবনের প্রথম পর্বে ব্রাহ্মধর্মের মোহে আবদ্ধ হয়ে পড়লেও পরবর্তীতে তিনি এই মোহ ত্যাগ করেন। পরে তিনি উপলব্ধি করেন প্রচলিত সকল ধর্মই মানুষকে সংকুচিত করে, মানুষকে একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে। তাঁর মনে হয়েছিল যে 'ধর্ম' কতকগুলি শুষ্ক, রসহীন, প্রাণহীন, আচরণ রীতি নয়। বরং তিনি ধর্মকে মানুষের অস্তিত্বের মূলে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় বলে মনে করেননি। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, আমার ধর্ম আমার জীবনের মূলে। তাই হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মের যখন মূল আলোচ্যবিষয় ঈ(ের, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনে মূলচরিত্র হিসেবে মানুষকে বেছে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'The Religion of Man' গ্রন্থে বলেছেন — "Man in God or God in Man" । এই গ্রন্থের অন্য আর-এক জায়গায় তিনি বলেছেন- ''আমার এই গ্রন্থের একটিই মাত্র উপজীব্য এবং তা হল মানবের দেবায়ন ও দেবতার মানবায়ন'' (Humanity of God and the divinity of man)। মানুষকে তিনি দেববতার আসনে বসাতে চেয়েছিলেন এবং দেবতার মানবত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি 'ভারততীর্থ' কবিতায় উল্লেখ করেছেন —

হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দনা করি তাঁরে।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনে আত্মা (আমি) এবং পরমাত্মা (ঈ(ের) এক ও অভিন্ন। তিনি এই দুই 'আমি'-র সম্পর্কে 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'দুই পাখি' কবিতাটিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন খাঁচার পাখি ও বনের পাখির ভালোবাসার মধ্য দিয়ে — ''এমন দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে তবুও কাছে নাহি পায় / দুজনে একা একা ঝপটি মরে পাখা কাতরে কহে কাছে আয়।''

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের ধারণায় একাধারে গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধদর্শন, শৈবদর্শন, বৈষ(ব, সহজিয়াভাব, সুফিবাদ, সন্তসাধনা, বাউল-ফকির-দরবেশের রবীন্দ্রায়ন ঘটেছে। তাঁর ব্যতিত্র(মী সৃজন নৈপুণ্যে ঘটেছে ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ। তাঁর কাছে প্রকৃত ধর্ম কেবল আচরণ সর্বস্য নয়, ধর্ম মানে দেহ-মন-বুদ্ধি-ইচ্ছার সামগ্রিক কর্ষণ তথা সমগ্র জীবনচর্চা-সমাজ ও বি(েমানবতার কল্যাণসাধন। জীবনের প্রতি বিমুখ হয়ে সমাজ-সংসারকে উপে(া করায় মুক্তি(নেই- এটি ধর্ম নয়। প্রকৃত মুক্তি(আসে জগতের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের তথা সমগ্র বি(ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত(করায় এবং জ্ঞান ও প্রীতির, সর্বজনীন মৈত্রীর প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সেবাকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ায়। কবির ভাষায়—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি(, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তি(র স্বাদ মহানন্দময়।

তাঁর কাছে যাগযজ্ঞের ধর্ম নয়, এই মানবপ্রেম ও সেবাধর্মই সিদ্ধিলাভের উপায়। মানুষের ধর্মগ্রন্থে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি পরিষ্কার বলেছেন — "... ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব — যেমন আগুনের ধর্ম অগ্নিত্ব, পশুর ধর্ম পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা।" তিনি বি(াস করেন, পরিপূর্ণতা লাভের অগ্রযাত্রায় মানুষ যা-ই অর্জন ক(ক-না-কেন, এই মানবধর্মকে সে কোনোদিন পরিত্যাগ করবে না, করা উচিতও নয়।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন মনুষ্যত্বের সার্থকতা বি(েজগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত(করার মধ্যে। তাকে বলতে হবে - "বি(ে সাথে যোগে যেথায় বিহার, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।" সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গেই শুধু নয়, সারাবি(ের সঙ্গে যুক্ত(করার মধ্য দিয়ে তাঁর মানবতাবাদের বিকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ তাঁর মানবতাবাদ ব্যক্তি(মানব থেকে বি(েমানবে উত্তরণের কথা বলে। মানুষ বি(েনাগরিক, সমগ্র মানব জগতের সৃষ্টি ও প্রকাশের সঙ্গে তার আত্মীয়তা। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদে কোনো দেশ ও কালের প্রাতিষ্ঠানিক ঐকান্তিকতা নেই।

রবীন্দ্রনাথ মানবধর্মের (ে ত্রে বারবার ত্যাগ ও তপস্যার কথা বলেছেন। তবে তাঁর মতে — "ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ত(তা লাভ করি এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতররূপে লাভ করার জন্যেই আমাদের ত্যাগ।" তাঁর মানবধর্মের মর্মবাণী হল অন্তরে অন্তরে সব মানুষই একই মানুষ — যার কোনো জাতি নেই, বর্ণ নেই, ধর্ম নেই।

অবশেষে এ কথা আমাদের বলতেই হয়, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ বাউল শ্রেষ্ঠ লালন ফকিরের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। লালন বলেছিলেন —

এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না রে চিনতে।

এই মানুষটিকে রবীন্দ্রনাথও সন্ধান করেছিলেন নিজের মনের গভীরে। তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন —

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায়, সকলখানে।

ব্যক্তি(মানুষের মধ্যে বি(েমানবের উপলব্ধির আকুতি চিরন্তন। মানুষই সাধনার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা

বারংবার তার স্থূল জীবসত্তাকে অবদমিত করে, অতিত্র(ম করে পরমসত্তাকে উপলব্ধি করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ব্যক্তি(মানুষ থেকে বি(েমানবের উপলব্ধির শেষ কথা হল, মানুষ নিজের আত্মার মধ্যে অপরের আত্মাকে জানতে পেরেছে। সকল আত্মার মধ্যে অভিন্নতা ও ঐক্যের সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। কবি বলেন, জ্ঞানে প্রেমে, সেবায় আমরা বি(ে-আত্মাকেই প্রকাশ করি। এটিই মানবজীবনের পরমাদর্শ। এই আদর্শে, মানুষের অন্তরের গতি ব্যক্তি(মানব থেকে বি(েমানবের দিকে প্রসারিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দর্শন মানুষকে তার জীবসীমা থেকে মানবসীমায় উত্তরণের দর্শন। এই মানব কোনো ব্যক্তি(মানব নয়, এই মানব বি(েমানব। আবার বি(েমানব কোনো বৃহৎ দৈহিক মানব নয়, ইনি বি(াত্মা। এক আত্মায় সকল আত্মার উপলব্ধি।

মানুষের বি(াত্মার উপলব্ধি তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। নিজের অন্তরের আত্মস্বরূপ দিয়ে সকল মানুষের আত্মায় মিশে যাওয়া, একাত্ম হওয়া। প্রত্যেক মানুষের অন্তরের এই প্রসারণই আধ্যাত্মিকতা। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দর্শন তাই আধ্যাত্মিক দর্শন। ব্যক্তি(মানবের বি(েমানবের দিকে অন্তরের প্রসারণই মানবিকতার ল(্য।

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, নিজের (ুদ্র স্বার্থের গন্ডিকে অতিত্র(ম করে সমাজস্থ সকল মানুষের কল্যাণের মধ্যে আত্মকল্যাণ অনুসন্ধান করাই হোক আমাদের আদর্শ। এই আদর্শ অনুসরণ করলে বি(েমানবসমাজ গড়ে উঠবে। বি(েমানব সমাজই হল আদর্শ সমাজ, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি(ই স্বাধীন। যেদিন বি(েজুড়ে মানুষে মানুষে সংঘাত, হিংসা, লোভ, দূরীভূত হবে সেদিনই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। এই আদর্শ সমাজ হল বি(েমানবসমাজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবতাবাদে মানুষকে সমাজকল্যাণে আত্মনিয়োগ করে বি(েমানবসমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।